Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৬৩তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই আষাঢ়, ১৪৩২ / 24.06.2025

:- সম্পাদক -:

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৬৩তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
৬৬-তে পার্থসারথি	সুনন্দন ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব	শ্রী প্রণব ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ	অনির্বাণ
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি	ঘটোৎকচ
পারোই তো নিজে এক কবিতা	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
দাও	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালবীয়া
কালগ্রাসে রথচক্র	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

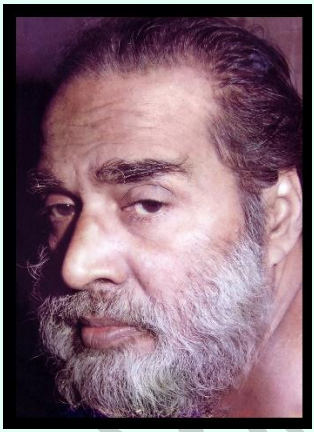

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"এই বিশ্বটাই ভগবানের কর্মলীলা। এই দিব্যকর্ম করতে হবে আত্মসংযম এর দ্বারা। আত্মসংযম মানে নিগ্রহ নয়। জোর করে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলেই আত্মসংযম হয় না। মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে লাগিয়ে রেখে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম করাই আসক্তি এবং আসক্তি বর্জন করে কর্ম করাই কর্মযোগের মূল কথা।"

শ্রী প্রীতিকুমারের দেহান্তর ঘটে ১৯৮৬-র নভেম্বরে। তার আগের বছর অর্থাৎ জুন, ১৯৮৫-তে পার্থসারথি পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। আষাঢ়, ১৩৬৭ (জুন, ১৯৬০) সালে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এই ছোট্ট তরণীর অভিযানের সূচনা। তখন শ্রীপ্রীতিকুমার ৩৪ বছরের যুবক। শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারায় লালিত এই পত্রিকায় শুরু থেকেই ক্রীড়া-চলচ্চিত্র-রাজনীতির উদ্দাম আকর্ষণ ছিলনা। কেবলমাত্র সম্পাদকীয়তে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত প্রতিফলিত হত। অনতিকালমধ্যে মননশীল এক পাঠক-গোষ্ঠী হয়ে উঠেছিলেন এর নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক। কেন্দ্রীয় সরকারের বিধি অনুসারে নিবন্ধিত একটা ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকার পক্ষে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সর্ববিধ নিয়মাবলী পালন করে প্রকাশের মান ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন সম্ভব হয়েছিল শ্রীপ্রীতিকুমারের অকল্পনীয় ধৈর্য্য নিষ্ঠা ও তদ্গতপ্রাণ জীবনচর্যার মহিমায়।

শ্রীপ্রীতিকুমারের আকস্মিক তিরোধানের পরেও তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসাকে সম্বল করে তাঁরই কল্পনাতীত সাধনশক্তির মহিমায় নিত্যনতুন প্রতিকূলতাকে সামাল দিয়ে অদ্যাবধি নিরন্তর ছোট্ট সেই তরীর যাত্রা।

২০১০ সালে পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী পার হয়েছিলো নীরবে। শ্রীপ্রীতিকুমার একাই ছিলেন এক প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। তাঁর অর্থবল বিশেষ না থাকলেও জনবল ছিলো, ছিলো সামাজিক প্রতিষ্ঠা। তাঁর চাকুরীজীবী উত্তরসূরীর পক্ষে সীমিত সামর্থ্য নিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন ছিল দুঃসাধ্য। যথাসময়ে এলো হীরক জয়ন্তী বর্ষ ২০২০। কোভিড আক্রান্ত দেশে প্রশাসনিক ও সামাজিক পরিবর্তনসমূহের ফলশ্রুতিতে

‘পার্থসারথি’র প্রকাশ মাধ্যমে এলো রূপান্তর – মুদ্রিত সংখ্যার পরিবর্তে অন্তর্জাল সংখ্যা। নতুন প্রজন্মের একঝাঁক গ্রাহক – স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ইন্টারনেটের অসীম তথ্যভাণ্ডার যাদের মুঠোয়, যাদের মূল্যবোধ, স্বপ্ন, জীবন জিজ্ঞাসা - অনেকটাই আলাদা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যথার্থ পাঠ্যক্রম তৈরি না হওয়ায় স্বাধীনতার পরবর্তী প্রতিটি প্রজন্মের রয়েছে স্বদেশ ও তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। তার সাথে যুক্ত হয়েছে আর্থ-সামাজিক কারণে জীবিকার জন্য কঠিন সংগ্রাম। সংস্কৃত তো দূরস্থান, বাংলা তদ্ভব তৎসম শব্দের সঙ্গে তাদের পরিচয় সামান্য। সনাতন ধর্ম, বেদ উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-চণ্ডী, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাণ, লোকায়ত দর্শন,এমন কি কম্প্যুটার-নির্ভর সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা - সব কিছু জানার আগ্রহ আছে তাদের, কিন্তু দীর্ঘ রচনা পড়ার সময় নেই । তাদের চাহিদাকে মর্যাদা দিয়ে পত্রিকার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেও সময়ের সাথে সাথে ‘পার্থসারথি’ তার অলঙ্করণ, বিন্যাস, বিষয় নির্বাচনে এনেছে বৈচিত্র্য। ঋতু বদলেছে, যাত্রী বদলেছে, নাবিকও বদলেছে, নৌকা বদলায় নি। যুগের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে তার বহিরঙ্গে। সাড়ে ছয় দশকের অক্লান্ত যাত্রার পরেও সেই ছোট্ট নৌকার দাঁড় বাওয়া আজও অব্যাহত।

বাংলা ভাষায় প্রতি বছর বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে ক’টিই বা স্থায়ী হয়! কোন মঠ মিশন প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য ছাড়াই ‘পার্থসারথি’ কেবলমাত্র ঈশ্বরানুগ্রহে হাজার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। ধর্মচর্চার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এর অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ।

‘পার্থসারথি’ বিশেষ কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মুখপত্র নয়। নানা ধর্মের মূলগত সত্য বা মানবতাপন্থী বিভিন্ন সাধন মার্গই এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয়; গীতা, বেদ-

উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীশ্রী চণ্ডী, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন, শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমার দিব্যজীবন সাধনা, রবীন্দ্রসাহিত্যে ঈশ্বর চেতনা, বৌদ্ধ ধম্মপদ, যীশুখ্রীষ্ট ও অন্যান্য মহামানবদের জীবন ও বাণী প্রভৃতি সার্বজনীন ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বিষয়ে ধারাবাহিক মননের ক্ষেত্র। শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীপ্রীতিকুমার সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নয়, ভিন্ন মতের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নয়, Henotheism বা সর্বোচ্চ-ঈশ্বরবাদ, আরও সরলভাবে বলতে গেলে 'যত মত তত পথ'-এর উদারতাই আমাদের শক্তি।

Website: https://www.parthasarathipatrika.com –এর মাধ্যমে প্রকাশিত হবার সুবাদে পত্রিকার বিস্তার এখন আক্ষরিক ভাবেই বিশ্বব্যাপী। জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে সমাজকে গঠিত করা এবং ধর্ম-পিপাসু মানুষের মুমুক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য যে জ্ঞানযজ্ঞের সূচনা, দীর্ঘ ৬৬ বছর ধরে তা নিরন্তর, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। জগতের সব কর্মকাণ্ডের পিছনে তাঁর ইচ্ছা ক্রিয়াশীল। 'পার্থসারথি'-র প্রকাশ ও প্রচারের নেপথ্যেও রয়েছে তাঁর অহৈতুকি করুণা। তাঁরই কৃপায় লেখক পাঠক সহায়ক-স্বজনের তন্নিষ্ঠ আবেগ নিয়ে গগনে উড্ডীন পার্থসারথির বিজয়কেতন।

জয়তু শ্রীপ্রীতিকুমার! **জয়তু পার্থসারথি!**

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

পার্থসারথির পাঠকবর্গকে জানাই ঁবিজয়ার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। পূজাটা আমাদের খারাপ কাটেনি – আশা করি সকলের ভালো কেটেছে।

হাতের লেখাটা আমার বড়ই খারাপ। তাই বোধহয় প্রেসের কম্পোজিটর ঠিক মত punctuation follow করতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি এখন তো কম্পোজিটরদের অনেক সুবিধে। যারা স্বর্গত শ্রী অনিল বরণ রায়ের লেখা কম্পোজ করেন নি তারা কি ভাগ্যবান! পার্থসারথি পত্রিকার জন্মকালে শ্রদ্ধেয় অনিল বরণ রায় ছিলেন নিয়মিত লেখক। সে কি সাঙ্ঘাতিক হাতের লেখা ! শ্রীপ্রীতিকুমার নিজেই Proof দেখতেন। Reading পড়বার জন্য আমাদের ডাকতেন। সে যে কি বিপদ! চোখের পলক এদিক ওদিক করা যেতো না। একটু Miss করলে কি ভীষণ বকাবকি করতেন। ঐ Proof দেখতে তাঁরও এক প্যাকেট সিগারেট শেষ হয়ে যেতো। আমাদের তো আতঙ্ক হয়ে যেতো। শ্রী অনিল বরণ রায়ের লেখা পড়তে হবে জানলে আমার রান্না আর শেষ হত না। এই বুঝি ডাক পড়ে। শ্রীপ্রীতিকুমার মোটামুটি আমার সাথে পেরে উঠতেন না। তাই শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

যাইহোক, প্রেস-এর পাল্লায় পড়লে অনেক শক্ত কথা সহজ হয়ে যায়। অনেক সহজ কথা উল্টে যায়। একবার তো "বিবৃত" আর "বিব্রত" শব্দের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল হয়ে গেছিলো। এবার একটা শব্দ দেখলাম "খেতে" যাচ্ছি। ওটার অর্থ আমিও বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ "খেতে" শব্দটা আসবে কোথা থেকে?

একবার লেখা ছিল শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যে গান না শুনেছে তার জন্য আমার দুঃখ হয়। ছাপা হয়ে যখন এলো দেখলাম "না" শব্দটা একেবারে লোপাট। ফলে একটা অন্য অর্থ দাঁড়ালো। শ্রীপ্রীতিকুমারের আমলে এরকম হলে তাঁর রাতের ঘুম চলে যেতো।

দীর্ঘদিন কলকাতায় থেকে হাঁফিয়ে উঠেছি। এবার লক্ষ্ণৌ যাব। ছুটি মাত্র ২৭ দিনের। তার মধ্যে পাঁচদিন পুজোয় কেটে গেলো। বাড়িতে কালীপূজা। অগত্যা দিন পনেরোর জন্য উধাও হওয়া যায়।। এবার যদি মন করে তাহলে বেনারসে নেমে বিশ্বনাথ দর্শন করে আসব। হয়ত কানপুরেও যাওয়া হতে পারে। আমার এখন আর একা একা কোথাও যেতে অসুবিধা হয় না। মালপত্র কুলি বয়ে নিলে আমার আর চিন্তা নেই। পুত্তরের সঙ্গে কোথাও গেলে একটি কুলিও করবে না। পয়সার জন্য নয়। তার Principle নিজের মাল নিজে বওয়া। ফলে আমার মাল আমাকে বইতে হয়। এবার উজ্জয়িনী গিয়ে যা কাহিল ছিলাম তা বোঝানো যায় না।

বেনারসে আমার খুব ভালো লাগে। আমি দুর্গাপূজার সময়েই গেছি কয়েকবার। একা একা। যদিও ঁবিশ্বনাথের মন্দিরে খুব ভিড় হয়, কিন্তু অত ভীড়ের মধ্যেও পূজা দেবার যে কি আকর্ষণ আছে তা বলবার নয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পাণ্ডা আছে শ্রী চন্দন। গত দু'বার আমাকে পূজা দিতে খুব সাহায্য করেছে। আমাকে ট্রেনে হিন্দী পত্রিকার এক রিপোর্টার বলেছিলেন স্পেশাল পূজা দিতে। বেশ অনেকটা সময় ধরে অনেকজন পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন। সেই গমগম আওয়াজ, সেই ধূপ ধূনোর গন্ধ ও ধোঁওয়া, দশ বারোজন পুরোহিতের একই মন্ত্রপাঠ, সে যেন সত্যিই একটি স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে। একা যাই, তাই কোনও অসুবিধা হয় না। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে থাকি। নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই থাকে না। তাছাড়া বেশীরভাগ বাঙালী ওখানে ফ্যামিলি নিয়ে দু' তিনদিন থাকেন। পরিবেশ খুবই শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গে মন্দিরের আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে। অনেক স্বামীজী পরিচিত আছেন। বিশেষ করে স্বামী সুন্দরানন্দজীর কাছে পুরাণ ও ভাগবতের কাহিনী শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় বোঝা যায় না। স্বামী বিবিদিষানন্দজী মোটামুটি পুজোর সময় কাশীতে থাকেন। তাঁর সময় খুব কম কিন্তু সবদিকে খুব তীক্ষ্ণ নজর। আমি কত তীর্থ ঘুরলাম, তাঁর কৃপায় আমার কোনও অসুবিধা কখনও হয় নি। পুত্র পুত্রবধূ সহ গিয়েও ওঁদের কাছে থেকেছি। আমার মনে হয় অত নির্ভয়ে আর কোথাও থাকা যায় না। গতবার লক্ষ্মীপূজার দিন আশ্রমে

ছিলাম। খুব ইচ্ছে ছিলো রাত্রে কাশীর গঙ্গায় পূর্ণিমার শোভা দেখব – হয় নি। স্বামীজীর নিষেধ ছিল তাই একা আর বেরোনো হয় নি। এবার লক্ষ্মীপুজোতে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে যাব ভোরে। তেমন ইচ্ছেই রয়েছে।

আমাদের সংসার চলছে। ভালো কিম্বা মন্দ বলবো না, কারণ ভালো মন্দ নির্ভর করে নিজের উপর। শ্রীপ্রীতিকুমার একবার বলেছিলেন, "জল ভাগ করা যায় না।" সত্যি তাই – ভাগ করতে পারছি কোথায়? আমার পুত্তর সংসারী হোল প্রায় আট মাস। আমার পুত্রবধূ আমাকে খুব যত্ন করে। আমি তাকে সব ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা করি। সেতো আমার পুত্তরের থেকেও প্রায় দশ বছরের ছোট। আমার থেকে অনেক অনেক ছোট। কিন্তু সে খুব স্বাভাবিকভাবেই মন দিয়ে সংসার করে। মাঝে মাঝে আমার পুত্তরের সাথে আমার খুব বিরোধ হয়। মনে হয় দু' চোখ যেখানে যায় চলে যাই, কিন্তু বৌটির কথা মনে পড়তেই ফিরে আসি। তার সাথে তো আমার কিছু হয় নি। আমি মোটামুটি High Pitch-এ কথা বলি। আমার পুত্তর ও পুত্রবধূ দুজনেই মিউ মিউ Tone-এ কথা বলে। তাই যারা আসেন, খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভাবেন শাশুড়ি মহিলা খুব দজ্জাল। আমার কিছু করবার নেই। কারণ আমি অভিনয় শিখি নি। আমি একই ভাব বরাবর বজায় রেখেছি। আমি Self made ও পরিশ্রমী মহিলা। আমার কাজ ও সংসার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ নজর আমাকে স্বার্থপর করে তোলেনি। তাই শ্রীপ্রীতিকুমারের গোটা সমাজটাই আমার কাছে আসে। দু'হাতে পয়সা খরচ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর পয়সা খরচ না করলে বন্ধুরা সহায়তা করে, আত্মীয় স্বজনেরা নয়। এটা আমার অভিজ্ঞতা। আমি যা কিছু লিখি বা বলি সেটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে, কারো কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করে নয়।

শ্রীপ্রীতিকুমার আমার সাথে খুব মিষ্টি করে কথা বলতেন তাঁর শেষ জীবনে। কিন্তু ততদিনে খেটে খেটে আমার এতো পরিশ্রান্ত অবস্থা হয়েছিল যে সেই মিষ্টি কথাগুলি আমি হৃদয়গ্রাহ্য হিসেবে নিতে পারতাম না। আমি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার পৌত্রীকে আমি তার দশদিন বয়স থেকে লালন পালন করেছিলাম। গত ছ' বছর ধরে তারা আমাদের কাছে নেই। মেয়েটার প্রতি আমার আজও দুর্বলতা আছে।

তাদের মা কি অত্যাচার অপমান আমাদের করলো তা যারা না জানেন আমার লেখার মাধ্যমেই বুঝতে পারবেন। তবু ক্ষীণ আশা ছিল হয়ত মামলা মোকর্দমা করে তাদের ফেরৎ পাবো। গত ছ' বছর ধরে শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে প্রার্থনা করেছি আমাদের নাতি, নাতনী তাদের বাড়ীতে ফিরে আসুক। একটা ক্ষীণ আশা ছিল আসবেই তারা। কিন্তু এই দূর্গাপূজার দিনে ভেবেছি আমার কাছে সেই মেয়েটি সাড়ে তিন বছর ছিল, আমাকে চোখের দেখা দেখেনি কত বছর। প্রকৃতপক্ষে মামাবাড়ীতে ছ' বছর আছে। আর কি তারা আমাদের মনে রেখেছে? যাক্, তাদের মায়ের কাছে ভালো থাকুক। আমি হয়তো তাদের আর কোনও দিন দেখতে পাবো না। হয়তো সেটাই আমার প্রাপ্য। আমার খুব অবাক লাগে ঐ মেয়েটিকে আমি ছ' বছরেও কেন ভুলতে পারছি না ! তাকে তো আমি গর্ভে ধারণ করিনি। তবে সে কেন আমার সারা বুকটা জুড়ে আছে? আমার পুত্তরের এবার কোনও সন্তানাদি হলে আমি চাইবো আর যেন মেয়ে না হয়। যদি মেয়ে হয় আমি যেন আর আসক্ত না হই। এ যে কি কষ্ট তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আজ ছ' বছর ধরে সেই একই স্নেহ মায়া লালন করে এসেছি মনে মনে। হয়তো আমি ভুলই করেছি ..... ।

অনেকে আমাদের বাড়িতে আসেন। আমার পুত্রবধূর সামনে বারবার এমন ভাবেভঙ্গীতে প্রশংসা করেন, আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। শ্রীপ্রীতিকুমার এমন শুনলে বলতেন – "তোমার সংসারে নজর লেগেছে।" সত্যি সত্যি আমার সংসারে নজর লেগেছিল। কি সুন্দর একটা সংসার। বাইরের বিশেষ কিছু আত্মীয়ের দৈনিক আনাগোনা আর নাক গলানোর ফলে আমাদের সংসারে বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। এখন আবার স্থিতু হবার চেষ্টা করছি। আবার সেই বাইরের লোকের বিভিন্ন মন্তব্য। হতে পারে মানুষ এক জায়গায় হলে নানারকম কথা হয়, বাক্য বিনিময় হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি সব আচরণটাই মেনে নেবো। অল্প বিস্তর দুঃখ ব্যথা সবার জীবনেই আছে। সেটা আঁকড়ে ধরে দুঃখু দুঃখু করলে ভগবান সেই দুঃখবিলাসীই করে রাখেন। আমার মতে কর্মযোগ যার জীবনে নেই

সে নিজের জীবনে দুঃখ টেনে আনে, অপরের জীবনে দুঃখ সৃষ্টি করে। আমাকে কেউ Judge করতে পারে না। শ্রীপ্রীতিকুমার বলতেন, "তোমার স্বভাব হোল এক কড়াই দুধে এক ফোঁটা চোনার মতো। যা মনে হয় বলে ফেল।" কত চেষ্টা করেছি কিছু বলব না, কিন্তু বলে ফেলি। কেন স্পষ্ট কথা বলি জানি না। এতে হয়তো আমারই ক্ষতি হয়। তবে আমার চিন্তা নেই। আমার প্রিয়জনেরা আমাকে খুব ভালো করে চেনে, তাই আমার কোনও অসুবিধা হয় না।

আমি কর্ম না করে স্বামী সন্তানের যত্ন না করে যদি আশা করি আমার স্বামী ও সন্তান আমার হাতের পুতুল হয়ে থাকবে, তাহলে সেটা হবে আমার চরম ভুল। সেখানে আমি কিছুই আশা করতে পারিনা।

শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে এক দম্পতি আসতেন। আমার সাথে এখনও তাদের যোগাযোগ আছে। সেই ভদ্রমহিলা খুব দুঃখ করেন আমার কাছে যে তাঁর স্বামী তাকে ঠিক মতো দেখেন না, চান না। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশ। ভদ্রলোকের প্রায় ষাট। ভদ্রমহিলার খুব ইচ্ছে তার স্বামী তাকে নিয়ে Nicco Park-এ যান। কতবার ভেবেছি বলি আমাদের সাধারণ সংসারে প্রৌঢ়রা Nicco Park-এ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যান না। আর এই বয়সে নব-পরিণীত দম্পতির মতো রোমান্টিক হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কে বোঝে? ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা এবং বনেদী ঘরের। এই তো জীবন ! তারা আমাকে নিজের বৌদির মতো মনের কথা খুলে বলে, আর আমিও আমার বুদ্ধি মতো সুশিক্ষা দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার বুদ্ধি যে কতো কম সেতো কেউ জানে না। সে জানতেন শ্রীপ্রীতিকুমার, জানে আমার পুত্তর। এই কম বুদ্ধির জন্যই অনেক ভালো কথাও জোরে বলি আর সেই সুযোগটা অন্যে গ্রহণ করে।

কিশোরের শরীর ভালো নয়। তার সুস্থতা কামনা করে করে আমার মুখে পোকা পড়ে গেছে। কিন্তু তার নিজের জনেরা নিজেদের এখনও সংশোধন করেনি। ওঁরা কেনো বোঝেনা আমি জানি না। বাপী একবছর আগে আমাকে হাল ধরে

থাকতে বলেছিল। সেই একবছর ধরে আমি হালটা শ্রীপ্রীতিকুমারের হাতে দিয়ে আছি। কিশোর সেটা জানে, সেটা বোঝে। ছেলেটা আমার অসময়ে এতো সহায়তা করেছে – আমার এত দাবী পূরণ করেছে – বলবার নয়। কিন্তু আজকাল বড় ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। ও যদি হাল ছেড়ে দেয় তাহলে আমি জোর কোথায় পাবো? এই প্রথম ঁবিজয়ার দিন কিশোর এলো না। আমার খুব ফাঁকা লেগেছে। এবার ঁবিজয়া উপলক্ষে আমার কোথাও লৌকিকতা করা হল না কারণ আমি বাইরে চলে যাচ্ছি। এবার অনেক তীর্থদর্শনের বাসনা আছে। দেখি কি হয়! মনে হয় কিছুটা পারবো। তীর্থের একটা সুফল তো আছে। সে ফল তো আমি পাচ্ছিই।

এবার বোধহয় কয়েকজন পাঠককে ঠিক সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। কারণ লেখনীতে তেমন ধার নেই। আসলে একটা ঘটনা ঘটলে তারজন্য লিখতে যে সময় লাগে, এবার সে সময় পেলাম না। ঘুরে আসি, তারপর লিখব। আজ শেষ করি।

- - - - - - - - (** রচনাকাল – অক্টোবর, ১৯৯২)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব **শ্রী প্রণব ঘোষ**

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল ইংরাজী ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয় তার ঠিক সাড়ে চারশ বছর পরে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলেছিলেন, "যে রাম, সে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ"। লক্ষণীয় যে ঠাকুর রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের নাম করলেও কিন্তু চৈতন্যদেবের নাম করেন নি। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে - তিনি কি তাহলে চৈতন্যদেবকে অবতার বলে স্বীকার করেন নি? না, তা নয়। তিনি জানতেন মহাপ্রভুও পূর্ণাবতার। তবে কোন এক সময়ে যে তাঁর সন্দেহ ছিল না, তা নয়। তাঁর ভক্তদের মধ্যে দু-একজন মহাপ্রভুর অবতারত্বে

সন্দেহ করতেন। তাঁদের সন্দেহের কথা শুনে তিনি বলেছিলেন - আমারও তখন তখন ঐরকম মনে হত রে, ভাবতুম পুরাণ, ভাগবত কোথাও কোন নাম গন্ধ নেই - চৈতন্য আবার অবতার। নেড়া নেড়ীরা টেনেবুনে একটা বানিয়েছে আর কি! কিছুতেই ও কথা বিশ্বাস হত না। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় তো সেখানে কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্যে এখানে ওখানে, বড় গোঁসাইয়ের বাড়ী, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ী ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম – কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। সব জায়গাতেই এক এক কাঠের মরদ হাত তুলে খাড়া হোয়ে রয়েচে দেখলুম। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল, ভাবলুম কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি এমন সময় দেখতে পেলুম। অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে - এমন রূপ কখনও দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল - হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আসছে। অমনি ‘ঐ এলো রে, এলো রে’ বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকট এসে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এর ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম, হৃদু নিকটে ছিল, ধরে ফেললে। এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল - বাস্তবিকই অবতার - ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ।

এর আগেও ঠাকুরের আর একটি দর্শন হয়েছিল। কামারপুকুরে অবস্থান কালে একবার পাল্কী করে শিহড়ে হৃদয়রামের বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে হঠাৎ দেখলেন তাঁর দেহ থেকে দুটি কিশোর বেরিয়ে এসে ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছে -কখনও বনফুল অন্বেষণে দূর প্রান্তরে চলে যাচ্ছে, কখনও বা নিকটে এসে হাস্য পরিহাস করতে করতে এগিয়ে চলেছে। অনেকক্ষণ এইভাবে আনন্দে ভ্রমণ করে তাঁরা আবার তাঁর দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এই দর্শনের কথা শুনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলেছিলেন - বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ, এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব - শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে এসে তোমার ভিতর রয়েছেন। সেই জন্যেই তোমার এই দর্শন হয়েছিল।

ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসার আগে থেকেই ঠাকুর গায়ের জ্বালায় খুব কষ্ট পেতেন। সূর্যোদয়ে জ্বালা শুরু হত এবং বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জ্বালাও বাড়ত। দুপুরে জ্বালা এতই অসহ্য হত যে গঙ্গার জলে শরীর ডুবিয়ে ও মাথায় একখানা ভিজে গামছা চাপা দিয়ে তিনি দুই তিন ঘন্টা বসে থাকতেন। তারপর জল থেকে উঠে কুঠিঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি দিতেন। কৃষ্ণবিরহে চৈতন্যদেবের শরীরেও অনুরূপ জ্বালা হত। সুগন্ধি স্রকচন্দন ব্যবহার করলে ঐ জ্বালার উপশম হত। ব্রাহ্মণীর পরামর্শ অনুসারে ঠাকুরের শরীরও মাল্যভূষিত ও চন্দনলিপ্ত করা হয়। তিনদিন পর ঠাকুরের গায়ের জ্বালা সম্পূর্ণ দূর হয়।

ভগবৎ প্রসঙ্গে ঠাকুরের ঘন ঘন ভাব সমাধি হয়, দেহে নানা সাত্ত্বিক বিকার দেখা যায়। মহাপ্রভুর সঙ্গে ঠাকুরের শরীর মনে প্রকাশিত লক্ষণ সমূহের অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণীর সুদৃঢ় ধারণা হয় মহাপ্রভুই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে পুনরাবির্ভূত। সুপণ্ডিত বৈষ্ণব আচার্যদের কাছে তিনি নিজের বক্তব্য প্রমাণ করতেও প্রস্তুত। এ কথা শুনে মথুরবাবু বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীকে দক্ষিণেশ্বরে সাদর আহ্বান জানান। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বৈষ্ণবচরণ উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণী ধর্মসভায় যুক্তিসহকারে নিজের অভিমত পেশ করেন। বৈষ্ণবচরণ সর্বান্তঃকরণে ব্রাহ্মণীর সকল কথাই মেনে নেন। অধিকন্তু তিনি বলেন, যে উনিশ প্রকার ভাবের সমষ্টিকে ভক্তিশাস্ত্র মহাভাব বলে নির্দেশ করেছে, সেই মহাভাবের সব লক্ষণগুলি শ্রীরামকৃষ্ণে প্রকাশিত। ইতিপূর্বে এই মহাভাব কেবলমাত্র শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে লক্ষিত হয়েছিল। ঈশ্বর কোটি ব্যতিরেকে কোন জীবের শরীর ঐ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ ধারণ করতে অক্ষম।

ঠাকুর একবার নিমন্ত্রিত হয়ে ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কলুটোলার হরিসভায় যান। চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে রচিত আসনের পাশে বসে জনৈক ভক্ত পাঠক তন্ময় চিত্তে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করছিলেন। পাঠ শুনতে শুনতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন এবং হঠাৎ ছুটে গিয়ে চৈতন্য-আসনের উপর দাঁড়িয়ে গভীর সমাধিতে ডুবে

যান। তাঁর জ্যোতির্ময় মুখে তখন প্রেমপূর্ণ হাসি এবং গৌরাঙ্গের ছবিতে যেমন দেখা যায় হাতও তেমনি উর্ধে উত্তোলিত। শ্রোতারা বিস্ময়াভিভূত হন। সবাই যেন ভাবতে লাগলেন তাঁরা সাক্ষাৎ মহাপ্রভুকেই দর্শন করছেন। এই অবস্থায় সকলে উচ্চরবে হরিধ্বনি শুরু করে। নাম শুনতে শুনতে ঠাকুরের অর্ধ বাহ্যদশা উপস্থিত হয়। তিনিও কীর্তনদলের সঙ্গে মিশে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। তার ফলে কীর্তনীয়াদের উৎসাহ শতগুণ বৃদ্ধি পায়। উপস্থিত ভক্তরা এই কীর্তনানন্দ উপভোগ করে নিজেদের ধন্য মনে করতে থাকে।

ঠাকুরের একবার বাসনা হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের নগর সংকীর্তন দেখবেন। দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন পঞ্চবটীর দিক থেকে এক বিরাট সংকীর্তন তরঙ্গ বকুলতলার দিকে আসছে, তারপর বকুলতলা থেকে বেঁকে কালীবাড়ীর প্রধান ফটকের দিকে যাচ্ছে এবং গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছে। এই বিরাট জনসঙ্ঘের মধ্যে তিনি স্বয়ং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভুকে লক্ষ্য করেন। হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে মহাপ্রভু ধীর পদে হেঁটে চলেছেন আর তাঁকে ঘিরে কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বা উদ্দাম নৃত্য করছে। এত লোক যে মনে হচ্ছে যেন জনসমুদ্র। এই বিরাট সংকীর্তন দলের মধ্যে দুজনের মুখ ঠাকুরের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে যায়। ঐ দুইজন হলেন কথামৃতকার শ্রীম এবং শ্রীবলরাম বসু। বলাবাহুল্য ঐ দুইজন পূর্বজন্মে চৈতন্যপার্ষদ ছিলেন।

ঠাকুরের প্রায়ই গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ হত। একবার কামারপুকুর থেকে শিহড়ে এলে তিনি গৌরাঙ্গের দর্শন পান - নব নটবর বেশ - 'কাল পেড়ে কাপড় পরা'। ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীরা পথে পথে কীর্তন করে বেড়াতে থাকে। শান্তিনাথ শিবের মন্দিরের উঠানে বহুক্ষণ ধরে কীর্তন চলে। সকলে মিলে গান ধরে-

সংকীর্তনে আমার গোরা নাচে
দেখোরে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে
সোনার বরণ গৌর আমার ধুলায় পড়ে পাছে।

গান শুনতে শুনতে ঠাকুর মহাভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েন-

বারে বারে এক ধুয়া যত ভক্ত গায়।
তাহাতে হইয়া প্রভু উন্মত্তের প্রায়।।
নাহি আর বাহ্যজ্ঞান কিভাবে কে জানে
লুটালুটি খান গোটা মন্দির প্রাঙ্গণে।।

এই অবস্থায় কানে নাম শুনিয়ে হৃদয় তাঁকে প্রকৃতিস্থ করেন। ঠাকুরকে নিয়ে শিহড়বাসীরা প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া গোপালের কীর্তন শুনতে মেমানপুর যাবার প্রস্তাব করে। ঠাকুরকে অবশ্য মেমানপুর যেতে হয়নি। হৃদয়ের মুখে ঠাকুরের কথা শুনে গোপাল নিজেই এসে হাজির হন। তিনি ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণাম করতেই ঠাকুর সমাধিস্থ হন। সমাধি ভঙ্গ হলে গোপাল কীর্ত্তন শুরু করেন -

ভুবন সুন্দর গৌর নদেয় কে আনিল রে।
এমন রূপ বিধি বুঝি দেখে নাই,
গড়েছে বটে, কিন্তু বিধি দেখে নাই,
দেখলে ছেড়ে দিত নাই।

আখর দেবার ছলে ঠাকুর গাইলেন –

গোপালরে তুই কি বল্লি রে,
গোরারূপ বিধির গড়া নয়
স্বয়ং স্বপ্রকাশ রূপ – বিধির গড়া নয়।

শিহড়ে থাকতে থাকতে ঠাকুর ফুলুই শ্যামবাজারেও গিয়েছিলেন। শ্যামবাজারের কথা ঠাকুর নিজের মুখেই বলেছেন –

"ওদেশে যখন হৃদের বাড়িতে ছিলুম তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলুম গৌরাঙ্গভক্ত গাঁয়ে ঢুকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম গৌরাঙ্গ। এমনি আকর্ষণ – সাতদিন সাতরাত লোকের ভিড়। কেবল কীর্ত্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক, গাছে লোক।

নটবর গোস্বামীর বাড়িতে ছিলুম, সেখানে রাতদিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতুম, সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে – খোল করতাল নিয়ে গেছে। আবার 'তাকুটী তাকুটী' করছে। খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হত।"

"রব উঠে গেল সাতবার মরে সাতবার বাঁচে, এমন লোক এসেছে। পাছে আমার সর্দ্দিগরমি হয় হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত; সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল – তাকুটী, তাকুটী। হৃদে বকলে, আর বললে, আমরা কি কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই? ..... "

"দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হত' তারা রাত্রে থাকত। ... আকর্ষণ কাকে বলে ঐখানেই বুঝলুম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকি লেগে যায়।" (কথামৃত)

ঠাকুর প্রতি বছর পেনেটীর মহোৎসবে যোগদান করতেন। এটি রাঘব পণ্ডিতের চিড়া মহোৎসব। দাস রঘুনাথ প্রথমে এই মহোৎসব করেন। প্রভু নিত্যানন্দ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন – তুই চিঁড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর। রাঘব পণ্ডিত পরে প্রতি বছর এই মহোৎসব করতেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুনে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে ঠাকুর কেমন গর্গর মাতোয়ারা হয়ে যোগদান করেছিলেন কথামৃতে তার বিবরণ আছে। নীচে তার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা হল।

পেনেটীর মহোৎসব ক্ষেত্রে পৌঁছিবামাত্র রাম প্রভৃতি ভক্তেরা আত্মহারা হইলেন – ঠাকুর গাড়ীতে এই আনন্দ করিতেছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিয়া তীরের ন্যায় ছুটিতেছেন। তাঁহারা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে নবদ্বীপ গোস্বামীর সঙ্কীর্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। পাছে পড়িয়া যান, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে অতি যত্নে ধারণ করিতেছেন। আর চতুর্দিকের ভক্তরা হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প ও

বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছেন। ঠাকুর অর্ধ-বাহ্যদশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহ্যদশায় নাম ধরিলেন –

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, ওই তারা দু' ভাই এসেছে রে।
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা দু' ভাই এসেছে রে!
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)

ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ করিতেছেন, গৌর-নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন। ঠাকুর আবার গান ধরিলেন –

নদে টলমল করে – গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। সঙ্কীর্তন তরঙ্গ রাঘব মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করিয়া, গঙ্গাকুলের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ির দিকে এই তরঙ্গায়িত জনসঙ্ঘ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়িতে সঙ্কীর্তন দলের কিয়দংশ প্রবেশ করিতেছে – অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কেবল দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিয়া উঁকি মারিতেছে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙ্গিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন। কীর্তনানন্দে গর্গর মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন, আর চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে। হরিনামের রোল আঙ্গিনার ভিতর মুহুর্মুহু হইতেছে। সেই ধ্বনি রাজপথে পৌঁছিয়া সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভাগীরথী বক্ষে যে সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ অবাক হইয়া এই সমুদ্র কল্লোলের ন্যায় হরিধ্বনি শুনিতে লাগিল ও নিজেরাও 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিল। পেনেটির মহোৎসবে সমবেত সহস্র নরনারী ভাবিতেছে এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একজন ভাবিতেছে ইনিই বা সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রী অরবিন্দ তাঁর যোগকে বলেছেন, 'পূর্ণযোগ'। তাঁর উক্তি - 'All life is yoga' – সমস্ত জীবনটাই একটা যোগ। শুধু চিত্তবৃত্তির নিরোধই নয়; তাকেও ছাপিয়ে চেতনার রূপান্তরসাধনই যোগের সামগ্রিক লক্ষ্য। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগ তার অন্যতম উপায় হতে পারে, কিন্তু পূর্ণযোগের পক্ষে তা অপরিহার্য নয়। বরং বেদে এবং উপনিষদে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না করেও বোধিচেতনার আবেশে বৃহৎকে সর্বত্র অনুভব করবার যে অনুশাসন আছে, তার সঙ্গে পূর্ণযোগের মিল বেশী। এই সহজ যোগ গীতোক্ত যোগেরও ভিত্তি। সুপ্রাচীন কাল হতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সব মরমীয়াই এর কথা বলে গেছেন। এমনকি প্রসঙ্গক্রমে পতঞ্জলিও 'ক্রিয়াযোগ' বলে এর উল্লেখ করেছেন।

ক্রিয়াযোগ কি - না চলতে ফিরতে যোগ। তার মুখ্য সাধন হল ঈশ্বর-প্রণিধান; অর্থাৎ জীবনের সকল অবস্থায় ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাঁর অনুভবে আবিষ্ট থাকা। তখন সমাধি আপনা হতে এসে যায়, তার জন্য সাধ্য সাধনা করতে হয় না। আর তখনই 'All life is yoga'।

আবার পূর্ণযোগে আছে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি – এই তিনটি যোগের সমন্বয়। সংস্কারবশে কেউ কর্মের দিকে, কেউ জ্ঞানের দিকে, কেউ বা ভক্তির দিকে ঝোঁকে। মানুষ যতক্ষণ মনের ঊর্দ্ধে উঠতে না পারে, ততক্ষণ এদের একটা ঝোঁককে প্রবল করে অপরগুলির প্রতি নিঃস্পৃহ বা বিরূপ হওয়া তার পক্ষে নৈসর্গিক। জ্ঞানমার্গী আর ভক্তিমার্গীদের মধ্যে বিসংবাদের কথা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু মনের ঊর্ধ্বে যে বিজ্ঞান, তার আলো এসে পড়লে মনের এই দ্বন্দ্ব ও সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে যায়। মন তখন বুঝতে পারে, যদিও মানুষ মনঃপ্রধান, তবুও মনই তার চেতনার সবখানি নয় – মনের ঊর্ধে আরও দুটি ভূমি আছে বিজ্ঞান ও আনন্দ। আর বিজ্ঞানভুমিতে আরোহণ করা থেকেই সত্যকার যোগ সাধনার শুরু।

এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যেমন একবার উজিয়ে যেতে হবে নীচেকার বাঁধন কেটে, তেমনি আবার ঊর্দ্ধ ভূমির বিজ্ঞান এবং আনন্দের শক্তিকেও দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে। আর এটি করতে হবে শুধু একার মুক্তির জন্য নয় – সবার মুক্তি এবং অভ্যুদয়ের জন্য। সংসারে আমরা কেউ একা নই। তাই নিজে আমটি খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেললে চলবে না, তার রসের আস্বাদন সবাইকে দেবার জন্য আমরণ তপস্যা করে যেতে হবে – পরমেশ্বরের দিব্যকর্মের শরীক হয়ে।

এই হল পূর্ণযোগের আদর্শ।

জীবন শুরু হয় কর্ম দিয়ে। সুতরাং কর্মযোগের সাধনা আমাদের প্রথম সাধ্য। তার উপায় যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্ম করা। সমস্ত কর্মই অনুষ্ঠিত হবে ভগবানকে লক্ষ্য করে। কাজেই কর্মে কর্তৃত্বাভিমান থাকবে না, ফলাকাঙ্ক্ষাও নয়। আবার যেমন জ্ঞানের কর্ম আছে, তেমনি আছে ভক্তিরও কর্ম। একটির লক্ষণ আত্মানুশীলন, আর একটির সেবা।

কর্মযোগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে তাতে সহজে জ্ঞানের আলো ফুটে ওঠে। তখন গভীরভাবে আত্মসচেতন হয়ে আমরা জানতে চাই নিজেকে, ঈশ্বরকে এবং জগৎকে। এর নাম জ্ঞানযোগ। নিজেকে জানি আত্মচৈতন্যের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। সেই বিস্ফোরণে ঈশ্বর কি, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি, জগতের স্বরূপই বা কি, তা বুঝতে পারি।

যাকে গভীরভাবে জানি, তার প্রতি আমাদের ভালবাসা জন্মায়। তাই জ্ঞানের পর্যবসান হয় ভক্তিতে এবং প্রেমে। এমনি করে কর্ম জ্ঞান আর ভক্তি বস্তুতঃ কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না।

কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি তিনটিই মানুষের চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তি। এদের অনুশীলন ও সমন্বয়সাধনের দ্বারা জীবনে বিজ্ঞান ও আনন্দের উন্মেষ ঘটানো পূর্ণযোগের লক্ষ্য। গীতোক্ত যোগেও এই সমন্বয়ের কথা আছে।

এই পর্যন্ত আমরা চলতে পারি প্রচলিত যোগবিধিকে অনুসরণ করে। কিন্তু এখানে এসেই যোগের সাধনা থেমে যায় না। মানুষের যোগের পরেও আছে ঐশ্বরযোগ, যার উদ্দেশ আমরা গীতাতেও পাই। এই যোগই পূর্ণযোগের ভিত্তি।

মনকে নিয়েই মনের উজানে যাওয়া বা মানসোত্তর ভূমিতে আরোহণ করা শ্রীঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য। মনকে ছাপিয়ে আছে অতিমানস। আবার মন এবং অতিমানসের মধ্যে আছে মানসোত্তর ভূমির চারটি স্তর। তারা হল উত্তর মানস, প্রভাস মানস, বোধি মানস এবং অধিমানস। তারও পরে হল অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ও অতিমানস।

মন হতে অতিমানসে আরোহণের সংক্ষিপ্ত ছকটি হল এই - প্রথমতঃ দেহ-প্রাণ-মনের শুদ্ধি এবং উর্দ্ধায়ন। তার ফলে অন্তরের গভীরে চৈত্যসত্তার আবিষ্কার এবং হৃদয়ে চৈত্যপুরুষের প্রতিষ্ঠা। এই চৈত্যপুরুষই চিদগ্নিরূপে আমাদের অন্তরে থেকে আলোর পথে সবাইকে নিয়ে চলেছেন দিশারী হয়ে।

চৈত্যপুরুষের প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় পর্বে পর্বে মনের রূপান্তর। তখন বিদ্যুতের মত ঝলকে ঝলকে উত্তর-জ্যোতির শক্তি আধারে নেমে আসতে থাকে। ক্রমে সেই জ্যোতি আদিত্যপ্রভাস্বর হয়ে চিদাকাশে দানা বাঁধে।

দীর্ঘকাল পরে এই সৌরজ্যোতির রূপান্তর ঘটে সোম্যজ্যোৎস্নায়-বোধিমানসের প্রভাতরল পরিপ্লাবনে চেতনার আরেকটা দিগন্ত খুলে যায়। বেদের ভাষায় তখন চক্ষঃ পৃশ্নি এবং শ্রবঃ-রূপে দিব্য ইন্দ্রিয়সংবিতের আবির্ভাব হয়।

তারপর অনুভূত হয় আনন্ত্যের অনিবাধতায় একের বহু হওয়া – যেন আকাশে এক অব্যক্ত জ্যোতির ছড়িয়ে পড়া অগণিত নক্ষত্রের স্ফুলিঙ্গে। চেতনা তখন ব্যক্তিত্বের নির্মোক খসিয়ে মুক্তি পায় অধিমানসী মায়ার ভূমিতে। মন হতে অতিমানসে উত্তরণের এইটি শেষ সোপান।

অবশেষে ব্রহ্মের অতিমানসী অনুভাব দেখা যায়। মহাবিশ্বের অনাদ্যন্ত সংবর্তুল পরিস্ফুরণ এবং তারই অধিষ্ঠানরূপে সিদ্ধ চেতনায় হয় সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ পুরুষোত্তমের অনির্বচনীয় আবির্ভাব।

ঐশ্বরযোগের এই স্বরূপ। বলা বাহুল্য, এ যোগ শুধু ব্যক্তিরই নয়, বিশ্বেরও চিন্ময় রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। তাইতো তার সিদ্ধির দায় আমাদেরও। সিদ্ধের দৃষ্টি নিয়ে ব্যক্তির সমাজের দেশের বিশ্বের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনা করা আত্মসচেতন হয়ে এবং নিত্যজাগ্রত থেকে – জীবনে এই বীরব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে বিশ্বজননীর প্রত্যেক সন্তানকে।

বন্দেমাতরম।।

** শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে

"জীব কোনরূপ আঘাত পাইলে চকিত হয়। সেই সংকোচনই জীবনের সাড়া। জীবনের পরিপূর্ণ অবস্থার সাড়া বৃহৎ হয়। অবসাদের সময় ক্ষীণ হয় এবং মৃত্যুর পর সাড়ার অবসান হয়।"

-- **আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু**

ব্যাপক অর্থে এ জীবনের সাধনা – ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সাধনা। ধর্ম আগে থাকিলেও অর্থ, কাম হইতে সাধনার শুরু। অর্থ ও কাম যখন ঘটায় অনর্থ তখন ধর্ম উদ্ধার করে। তথাপি ধর্মে শেষ রক্ষা হয় না। অর্থাৎ পরিণামে 'মোক্ষ'। চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। এই মোক্ষ চিন্তাই বৌদ্ধ ধর্মের সারকথা। ইহার সহিত হিন্দু বা সনাতন ধর্মের কোন বিরোধ নাই। বিরোধ থাকিতে পারে না। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম মূলতঃ হিন্দুধর্মেরই একটা ভিন্নাবস্থা। গৌতমবুদ্ধ হিন্দু অবতারদের মধ্যে অন্যতম।

এইবার আসল বক্তব্যে আসিতেছি। 'মোক্ষ' বলিতে কি বুঝায়? মোক্ষের সাধনাই বা কেন? অল্প কথায় মোক্ষ শব্দের অর্থ - নির্বাণ বা চিরমুক্তি।

ত্রিবিধ দুঃখতাপে মনুষ্য জীবন জর্জরিত – আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক। দৈব হইতে ভয় আধিদৈবিক; ভূত হইতে ভয় আধিভৌতিক –আত্মার ভয় – আধ্যাত্মিক (spiritual)।

এই সংসার মায়াপ্রপঞ্চে কেহই সুখী নহে। কবি গাহেন-

"মহামায়ার ফাঁদে পড়ি ব্রহ্ম কাঁদে।"

এহেন সংসারে 'জীব' কি করিবে? আপাত দৃষ্টিতে জীবের আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাহার সৃষ্টিতে মানুষের হাত নাই তাহার ধ্বংসে তাহার অধিকার থাকিতে পারে না। অতএব আত্মহত্যা মহাপাপ। তাহা হইলে সংসারে থাকিয়াই মুক্তির উপায় খুঁজিতে হইবে।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়-
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়-
লভিব মুক্তির স্বাদ।" (রবীন্দ্রনাথ)

ইহা কি করিয়া সম্ভব? আত্মসংযম আর আত্মত্যাগের মহত্বে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য নাশে আত্মসংযম। আত্মসংযমের শক্তিতে আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগের মহত্বে পূনর্জন্মের নাগ পাশ হইতে মুক্তি বা মোক্ষ। আত্মত্যাগের মূল কোথায়? মহাপ্রেমে। এই মহাপ্রেমের নাম অহিংসা-জীবসেবা-মৈত্রী। ইহারাই ভগবান বুদ্ধের অষ্টমার্গের বিখ্যাত ত্রয়ী। বুদ্ধদেব কোন নূতন ধর্ম প্রচলন করেন নাই, তাঁহার আন্দোলন ছিল সংস্কারমূলক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম তিনটি আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত।

(১) পৃথিবীতে অশুভ আছে

(২) এই অশুভের কারণ কি?

(৩) নিবারণের উপায় কি?

নিঃস্বার্থপরতা বা আত্মত্যাগের দ্বারা সেই সহজাত 'অশুভ' কে নিবারণ করিতে হইবে – ময়লা দিয়া ময়লা ধোয়া যায় না। মনুষ্য জীবনে এই পথই নিত্যকালের পথ - নান্যপন্থাঃ। জীবই শিব। জীবের মঙ্গলেই শিবের মঙ্গল। অতএব শিবজ্ঞানে জীবসেবাই পরমার্থ। ঈশ্বরপ্রাপ্তি সাধারণ মানুষের কাম্য নহে। ঈশ্বরান্বেষণ যা বামন হইয়া চাঁদ ধরার মতই পণ্ডশ্রম। এই খানেই বৌদ্ধ মতের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মমতের বিরোধ হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেবকে ভুল বুঝার যথার্থ কারণ নাই। তাঁহার এই নির্দেশ তলাইয়া দেখার মত। মৃত্যু-রহস্যের আজ পর্য্যন্ত যেমন কিনারা হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর দর্শনেরও কোন মীমাংসা হয় নাই। মৃত্যু হইতেছে সেই অনাবিষ্কৃত দেশ যার প্রান্ত হইতে কোন পথিক আজও ফিরে নাই।

"Death is that undiscovered land
From whose bourn no traveller returns"
(Shakespeare)

সেইজন্য মৃত্যু রহস্যময়। ঈশ্বর দর্শন করিয়াছে কেউ জোর করিয়া বলিতে পারেনা বা অপরকে দেখাইতে পারিবে তেমন দুঃসাহসও নাই। গতিকে ঈশ্বরও রহস্যাবৃত!

প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে তবে কি বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন। না, তাহাও নহে। ব্যাখ্যার দোষেই হউক আর অজ্ঞতার অভিশাপেই হউক বুদ্ধবাণীর মর্ম ভারতে উপলব্ধ হয় নাই। বিবেকানন্দ যেভাবে বুদ্ধদেবকে সমর্থন করিয়াছেন, সেভাবে মনীষীদের মধ্যে আর কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। স্বামীজী বলিয়াছেন ঈশ্বরালোচনা হইতে বিরত থাকার নাম ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা নহে। বৌদ্ধধর্মের কোন অন্ধকার দিক নাই। বৌদ্ধধর্ম নাস্তিকতা শিক্ষা দেয় না। বিবেকানন্দের নিজের কথা দিয়াই শেষ করি- "বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই, নিজের জন্য কিছু দাবী করেন নাই। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

মৃত্যু শয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, আমি বা অপর কেহই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না। কাহারও উপর নির্ভর করিও না। নিজের মুক্তি নিজেই সম্পাদন কর।"

পারোই তো নিজে এক কবিতা **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

জানুয়ারি প্রায় শেষ এখনও শীতের রেশ
ঘরে আর থাকে নাকো মনটা-
উত্তরবঙ্গে গিন্নীর সঙ্গে
কাটাই না এ মাসের এন্ডটা!
তিস্তা-তোর্সা চড়ে এনজেপি এনু ভোরে
সিকিম না যাব কোথা ভুটানে?
দার্জিলিংটা বাদ মোর্চার উৎপাত
কখন কি ঘটে জানি সেখানে

মোটরেতে জয়গাঁও পথে হাসিমারাটাও
দেখে নিয়ে সোজা ফুন্টশিলিং-এ
'কোয়েঙ্গা' হোটেল থেকে 'পেলবে'র বাসে চেপে
ভুটানের রাজধানী যেখানে।
পথেতে 'চুখা'র কাছে লাঞ্চ খেতে থামা আছে
আর থামা 'তানালুং' পোস্টে
পাহাড়ে বরফ ছিল পরে সেটা পথে এল
গাড়ি সেথা চলে অতি কষ্টে।
কনফ্লুয়েন্সের কাছে দুই নদী যেথা মেশে
সেথা হতে রাজপথ শুরু যেই
পেলবের ছোট গাড়ি দৌঁড়ায় তাড়াতাড়ি
'থিম্পু' শহর আর দূরে নেই।
ক্লক টাওয়ারের কাছে অনেক হোটেল আছে
দেখে শুনে বেছে নিই একটা,
চলি 'এ.ভি.' হোটেলেতে রাতের খাবার খেতে
মোমো আর থুকপাটা খাস্তা।
থিম্পু শহর জানি ভুটানের রাজধানী,
রাজার প্রাসাদ গেছি দেখতে
চাইনিজ বুদ্ধ দেখে হই মুগ্ধ
'থিম্পু-চু' পারিনিতো ভুলতে।
পারমিট পেলে তবে পুনাখাও দেখা হবে
'ফোচু'-'মোচু' মিলনটা দেখবই।
'দোচুলার' পাস দেখে গায়েতে বরফ মেঘে
সেইদিনই থিম্পুতে ফিরবই।
ভুটানের আদরিনী 'পারো'র শহরখানি

সেই পারো ভ্যালি কাল দেখা চাই
কুল বাহাদুর ছিল তাল মিল হয়ে গেল
ভাড়া করি তার সিটি হণ্ডাই।
পরদিন সকালেতে, আমরা পারোর পথে
‘তাকসাং’ , ‘কিচু’ হবে দেখতে
পারোর বিমান ঘাটি কি দারুণ পরিপাটি
ভ্যালিতে দেখেছি প্লেন নামতে।
পারোর মিউজিয়াম, নয় সে কিছুতে কম
সেথা হতে দেখেছি যে ছবিটা-
‘পারো চু’র বয়ে যাওয়া সব চাওয়া হল পাওয়া
পারোই তো নিজে এক কবিতা!

থিম্পু

পারো এয়ার পোর্ট

পারো

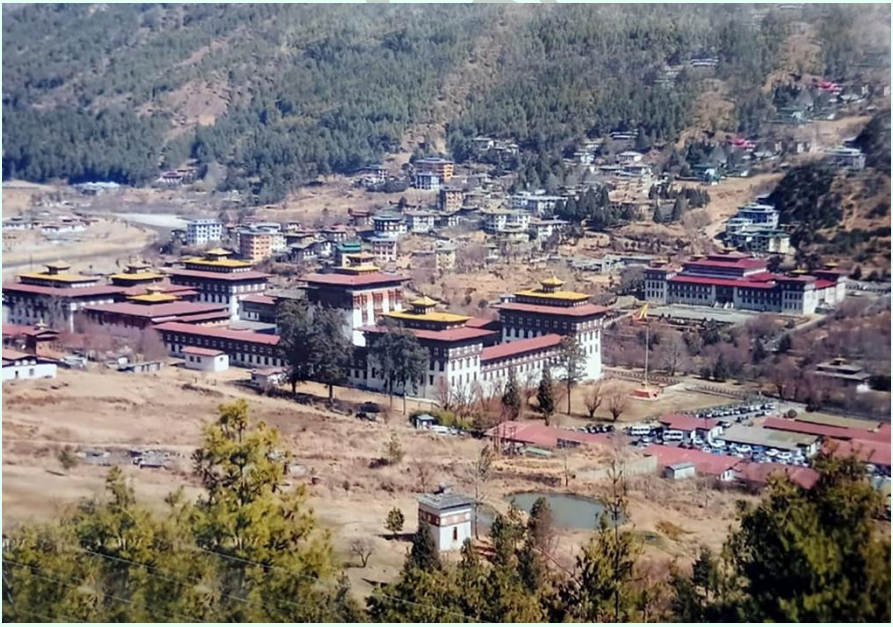

একনজরে থিম্পু

দাও

শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালবীয়া

জীবনে যদি কিছু পেতে চাও
দিয়ে যাও হাত ভরে,
কি পাবে তুমি কি না পাবে
দেখা যাবে তারপরে।
যারা দিতে জানে তারা দিয়ে যায়,
নেবার কথা যে ভাবে না,
যাচকের ঝুলি ভরে দেয় যারা
যাচঞায় তারা যাবে না।
দিয়ে দিয়ে যদি নিঃস্ব হও তবু
থাকবে মনের রাজা,
দেখবে যারা, ভাববে তারা
শখ করে সং সাজা।
দেবার হাত থাকবে উপরে
নেবে যে আঁচল পেতে –
দেবে আর নেবে, ভুলাবে ভুলিবে
খেলায় থাকবে মেতে ।

কালগ্রাসে রথচক্র **সুনন্দন ঘোষ**

সূর্য ডোবার আগে অস্তাচলে গেলেন রাধেয় কর্ণ।
রৌদ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন অর্জুন,
(হয়তো ভূদেবীর অভিশাপে)
তখনই মাটিতে বসে গেল রথের চাকা।
মাটিতে পা রাখলেন সশস্ত্র বসুসেন।
যোজনা করলেন ব্রহ্মাস্ত্র।
অসফল।
জমদগ্নি-পুত্রের অমোঘ অভিশাপে
বিস্মৃত হয়েছেন দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপের মন্ত্র
তৃতীয় পাণ্ডবের অঞ্জলিকাস্ত্রে ছিন্ন শির হওয়ার আগে।

অপযশ হনন নীরবে করেছিল কর্ণকে।
সারা জীবনের দান, ধ্যান, ত্যাগ, তিতিক্ষা,
'বিজয়'ধনুর পরাক্রম –
হারিয়ে গেলো পাঞ্চালীর বিস্রস্ত বসনে,
অভিমন্যুর রক্তস্নানে।

পুরাণের কাহিনী রূপ নেয় কল্পান্তরে,
আর জি কর, কামদুনি, ধূলিয়ান, মহেশতলা,
সর্বত্র রক্তধারা, সর্বত্র নীরব অভিশাপ ---
রাজ্ঞীর রথচক্র গ্রাস করছে রক্তাক্ত মেদিনী,
সূর্যাস্তের আগে।